ভারতবর্ষে ধর্মের ভূমিকা

সুকুমারী ভট্টাচার্য

ধর্মের ভূমিকায় ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ধর্মের নৈতিক দিকটি সমাজকে ধারণ করে, যাতে ব্যক্তিস্বার্থ গোষ্ঠীস্বার্থকে আঘাত না করে; এই অর্থেই 'ধৃ' ধাতুতে 'মণিন' প্রত্যয়ে ধর্ম শব্দটি সিদ্ধ হয়। কিন্তু নৈতিক নির্দেশ ছাড়াও ধর্মে আরও কিছু-কিছু দিক থাকে, যেমন আনুষ্ঠানিক দিক, বিশ্বাসের দিক ইত্যাদি। সাধারণত বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই অনুষ্ঠান হয়। দেবতাদের স্তবে, নৈবেদ্যে প্রসন্ন করে কিছু চাইলে তাঁরা তা দেন এইটি যজ্ঞের যুগের মুখ্য বিশ্বাস। এর মধ্যেও বেশ কয়েকটি অঙ্গ আছে বিশ্বাসে (১) দেবতারা আছেন (২) মানুষের প্রার্থনা তাঁরা শোনেন (৩) মানুষের প্রার্থনাপূরণের ক্ষমতা তাঁদের আছে (৪) এই প্রার্থনা-পূরণ তাঁরা করে থাকেন যথাবিহিত স্তব ও নৈবেদ্য পেলে। এই সব বিশ্বাসের ফল যজ্ঞানুষ্ঠান। বৈদিক যুগে খ্রীস্ট-পূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে ষষ্ঠ শতক কিংবা তারও কিছু পরে পর্যন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান হত। পরে পশু কৃষির কাজে বেশি প্রয়োজনীয় হওয়ায় যজ্ঞে পশুবলির যথেচ্ছ অপচয় বন্ধ হওয়ার পরে, ক্রমে প্রথমে অহিংস ধর্মাচরণ ও পরে জ্ঞানমার্গের কিছু ধর্মবিশ্বাস—আজীবিক, বৌদ্ধ, জৈন ও উপনিষদ্—সমাজে বিস্তার লাভ করে। এরই কিছুকাল পরে খ্রীস্ট-পূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতক থেকে পূজার প্রচলন হয়। তখন বেদের দেবতার মতো নিরাকার দেবতার উপাসনা, মুক্ত ভূমির উপর কুশ বিছানো বেদীতে হত না; তখন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। বিগ্রহ এসেছে, অন্য নৈবেদ্য (দুগ্ধজাত খাদ্য ও ফল; আমিষ নৈবেদ্য প্রায় বন্ধ) হয়েছে। দেবতারাও প্রায় আমূল পরিবর্তিত হয়েছেন, সংখ্যায় অনেক বেড়েছেন। এর শাস্ত্র মহাভারতের শেষ প্রক্ষেপ—ভার্গব মনুনিদের রচনা—ও পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়।

যজ্ঞনির্ভরই হোক, পূজাভিত্তিকই হোক, ধর্ম মানুষকে কী দিয়েছে? শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্য বাদে সমাজে অনেক সংঘর্ষ ঠেকিয়েছে ধর্ম, সম্প্রীতির বাণী প্রচার করে। মানুষকে একধরনের সংহতি ও নিরাপত্তার বোধ দিয়েছে। আর ভরসা দিয়েছে, অদৃশ্য কোনো দেবলোকে মানুষের হিতৈষী দেবতারা তাদের বিপদে সাহায্য করেন। আয়ু, স্বাস্থ্য, বিত্ত, বিজয়, সন্তান, স্বর্গ, এমন কী মোক্ষও দেন। সত্য হোক, মিথ্যা হোক—মানুষ অসহায় অবস্থায় ঐকান্তিক আগ্রহে কামনা করেছে এই ভরসা, যা সে ধর্মের কাছ থেকে পেয়েছে।

বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে যজ্ঞের ওপরে মানুষের বিশ্বাস টলে যেতে থাকে, পূজা

আসে। দেবতাকেন্দ্রিক নানা সম্প্রদায়—তার কিছু-কিছু বেশ কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই ছিল—দেখা দেয়। পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রে এই সময়কার ধর্মশাস্ত্র রচিত হয়। জন্মান্তরবাদ খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতক থেকেই ছিল, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কাছাকাছি তার সঙ্গে যুক্ত হয় কর্মবাদ ও নিয়তিবাদ। পুরোহিত ও শাস্ত্রকারেরা সমাজের অভিভাবক হয়ে ওঠে। সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কতকটা ঈর্ষাবিদ্বেষের সম্পর্ক ছিল, আবার পরস্পর-সহিষ্ণুতাও ছিল। কিন্তু সাধারণ দুঃখী মানুষকে বহু শতাব্দী ধরে বলা হতে লাগল তার দুঃখের কারণ (১) তার নিজেরই পূর্বজন্মের দুষ্কর্ম (২) নিয়তি। এ দুটো পরস্পরবিরুদ্ধ এবং কোনোটারই কোনো প্রমাণ নেই তবু শাস্ত্র ও পুরোহিতদের কথাই মেনে নিল লোকে। তার একটা কারণ, অধিকাংশ দুঃখী দরিদ্র মানুষ কোনোমতেই বুঝতে পারছিল না তাদের দুর্দশার কারণ কী। পুণ্যবান্ লোকও দুঃখ পাচ্ছে, আর দুরাচার ব্যক্তি সবরকমে আরামে আছে—এই ব্যাপারটার কোনো ব্যাখ্যা তারা পেত না। তাই তাদের বোঝানো হল গত জন্মের পাপেই তাদের দুঃখ, এ জন্মটা উচ্চ ত্রিবর্ণের ধনীদের সেবা করলে আগামী জন্মে সুখের সম্ভাবনা আছে। এখন পূর্বজন্মও অভিজ্ঞতার বাইরে, আগামী জন্মও তাই, কাজেই মানুষকে বোঝানো হল, অলক্ষ্যে অ-দৃষ্ট তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থাৎ সমাজের অত্যাচার অন্যায় অবিচারকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হল, যে সমাজের ওপরতলার লোকেরা নিচুতলার মানুষের নিষ্প্রতিবাদ সেবা পেয়েই চলবে, একটা মিথ্যা প্রত্যাশায় প্রবঞ্চিত হয়ে।

যজ্ঞ অর্থাৎ কর্মকাণ্ড যখন ক্রমেই নানা নামে ও জটিলতায় ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠছিল এবং সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল, তখন তার প্রতিবাদে ধীরে ধীরে জ্ঞানকাণ্ড নানা প্রস্থানে সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করল : উপনিষদ্, আজীবিক, বৌদ্ধ, জৈন ও নানা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে, যাদের সকলের বিস্তৃত পরিচয় আজ আর বিশেষ পাওয়া যায় না। এরা সকলেই জন্মান্তরে ও মোক্ষে বিশ্বাসী এবং আজীবিক বাদে বাকি প্রায় সকলেই কর্মবাদেও বিশ্বাসী। কিন্তু এগুলির মধ্যে দর্শন ও তত্ত্বগত দিক সবটা জনসাধারণের বোধগম্য হত না, নীতি ও সামাজিক নির্দেশের মধ্যেই এগুলি ক্রমে সীমিত হল। কিছুকাল পরে জৈনধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মেই কার্যত অন্তর্ভুক্ত হল, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রভাব ভারতবর্ষ থেকে অন্তর্হিত হল ; সমাজ তখন পৌরাণিক, সম্প্রদায়-বিভক্ত, ও প্রধানত পূজানিষ্ঠ। বহু নতুন দেবতার আবির্ভাব হচ্ছিল এবং তাদের ঘিরে নতুন নতুন বিশ্বাস-সম্প্রদায় গড়ে উঠছিল। যদিও শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য প্রধান ছিল, তবু এগুলি ছাড়াও অসংখ্য সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল। জনমানসের এক এক ধরনের প্রয়োজন মেটাত এক এক সম্প্রদায় ; এবং প্রায় প্রত্যেক সম্প্রদায়েই কালগত বিবর্তন দেখা দিয়েছিল তত্ত্ব ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে। এসব বিবর্তন এসেছিল সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের পরিবর্তিত আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটাতে। তবুও ক্রমে-ক্রমে সব সম্প্রদায়ই শিলীভূত হয়ে যেতে থাকে, বিশ্বাস করে তার মতটিই একমাত্র সত্য, বাকিরা ভ্রান্ত।

তাছাড়া মুসলিম-বিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়ে, মুসলিম সমাজেও হিন্দু-বিদ্বেষ জন্মেছিল। দুইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান ছিল সুফীসম্প্রদায়ের। মধ্যযুগের শেষদিকে প্রতিবাদের প্রবক্তা হিসেবে দেখা দেন কবীর, নানক, দাদূ, রামদাস, শংকরদেব, চৈতন্য, জ্ঞানদেব এঁরা। এঁরা প্রত্যেকেই সম্প্রীতির কথা বলেন, মোল্লা-মৌলভি পাণ্ডা-পুরোহিতদের স্বার্থসর্বস্ব ভূমিকার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন, জাত-পাতের অসারতা প্রচার করেন এবং সাধারণ দুঃখী মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এমন এক ধর্মবোধের কথা বলেন যেখানে বিভেদ গৌণ, মানুষে-মানুষে মিলনই সত্যতর, যেখানে ধর্মগুরু বা পুরোহিতরা বা সমাজপতিরা নিচুতলার মানুষকে শোষণ করতে পারে না। এঁদের ঈশ্বর দীনহীনকে আশ্রয় দেন, সাহায্য করেন সর্বভাবে। কিছুকাল এঁদের শিষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিবাদটি জীবিত থাকে এবং সমাজের এক অংশের প্রাণবত্তাকে ধরে রাখে। কিন্তু মূল ধর্মসম্প্রদায়গুলি দু-ভাবে সক্রিয় হয়। প্রথমত, প্রতিবাদীদের নানাভাবে পীড়ন নির্যাতন করে, কারণ ওই মূল ধর্মগুলির আচার্য পুরোহিতরা অধিকাংশ স্থলেই রাষ্ট্রশক্তির কাছাকাছি থাকে এবং সে শক্তির সাহায্যে এদের অত্যাচারের ক্ষমতা অব্যাহত হয়। দ্বিতীয়ত, প্রতিবাদী মতগুলির কিছু-কিছু তত্ত্ব এরা মূল ধর্মতত্ত্বের মধ্যে স্বীকার করে নেয়। এছাড়াও, প্রতিবাদী মত যদি প্রতিষ্ঠা পায়, তাহলে তাদের অনুগামীদের সংখ্যাবৃদ্ধি হলে কিছুকাল পরে প্রতিষ্ঠার পথ ধরে আপনিই আসে অবক্ষয়, ঘুণ ধরে সম্প্রদায়ের মধ্যে ; বিভেদ সৃষ্ট হয় ও ধীরে ধীরে সেগুলি ক্ষীণবল হয়ে হয়ে লোপ পায়, নয়ত মূল ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এমনি করেই মধ্যযুগের সন্তদের নির্মিত সম্প্রদায়গুলির জীবনীশক্তির ক্ষয় হল একদিন।

শোষণ ও নির্যাতন থামেনা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে, তাদের রূপ পরিবর্তিত হয় মাত্র। ইংরেজ রাজত্বের একটি মূল রাষ্ট্রনীতি ছিল হিন্দু-মুসলিমের বিভেদ ঘটিয়ে নিজের রাষ্ট্রশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা। দেশের সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মীয় সামাজিক পীড়নের সঙ্গে জুড়ল বিদেশি রাষ্ট্রশক্তির চাপ। সমাজের বিন্যাসে নতুন শ্রেণীভেদ হল। বর্ণবৈষম্য, জাত-পাত, ধনী-দরিদ্র এ ভেদগুলি তো ছিলই, তার সঙ্গে সংযুক্ত হল 'বাবু' অর্থাৎ ইংরেজিশিক্ষিত, এবং অধিকাংশক্ষেত্রে ইংরেজের দরবারে চাকুরিজীবী নতুন এক শ্রেণী ; বাকিরা যারা ইংরেজি জানে না, পাশ্চাত্য প্রভাবের বাইরে চিরাচরিত জীবনযাত্রায় যাদের দিন কাটছে তারা ক্রমেই সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে উঠল। 'ভদ্রলোক' ও 'ছোটলোকে' ভাগ হয়ে গেল সমাজ। অপ্রত্যক্ষ, গৌণ আর এক পীড়ন এল জনসাধারণের জীবনে। ধর্ম তখন নানা নামে বিরাজিত—হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তো ছিলই, ইসলামও ছিল, নতুন এল খ্রীস্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, আর্যসমাজী, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-পন্থী আরও ছোটবড় নানা সম্প্রদায়। মৌলিক ভেদটা—ভদ্রলোক-ছোটলোকের—রয়েই গেল।

এই অপরিচিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, ধনী দরিদ্রের শ্রেণী-বৈষম্য, ক্রমবর্ধমান জাতপাতের কঠোর নির্দেশ, নানা ধর্মের বিভ্রান্তিকর পরিমণ্ডল,

এবং এরই সঙ্গে ভদ্রলোক-ছোটলোকের দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ প্রবলভাবে বিচ্ছিন্ন অংশ। আবার প্রতিবাদ দেখা দিল সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশে। যদিও খ্রীস্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, আর্যসমাজীদেরও বহু অনুগামী ছিল দরিদ্র অশিক্ষিতদের মধ্যেও, তবু এগুলি মূলত ভদ্রলোকের মধ্যে অভ্যুত্থিত এবং এদের ভক্তমণ্ডলীর অধিকাংশই শিক্ষিত। ভদ্রলোকের সমাজে যেমন এইসব প্রতিবাদী সংস্থা, সমাজের প্রত্যন্ত দেশে তখন আর এক চিত্র। একদিকে জীবন-জীবিকার প্রবল চাপ, বিদেশী শাসনব্যবস্থার অবোধ্য রাজযন্ত্র, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচারের নানা নতুন মাত্রা যোগ হতে লাগল দুঃখীর জীবনে। হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হল সাধারণ মানুষ। পাশ্চাত্যীকরণের নতুন পরিমণ্ডলে, অভাবের নতুন চেহারায়, চাকুরির নতুন নিয়মকানুনে, বিচারব্যবস্থার পরিবর্তনে, সর্বাঙ্গীন বঞ্চনার লক্ষ্য এই দরিদ্রসাধারণের মধ্যে অসহ্য একটা বস্তুগত জীবনের ও মানসিক পরিবেশের মধ্যে প্রতিবাদ এল আবার মূল ধর্মধারার বাইরে সরে গিয়ে নতুন মত ও পথ ঘোষণা করে। কখনো যৎসামান্য অনুষ্ঠানে, কখনো নতুন আচারে, কখনো প্রতীকী উপাসনায়, কখনো নতুন ধরনের গুরুবাদে এঁরা প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন, গোপনে, বড় রাস্তা থেকে সরে গিয়ে, সবার অলক্ষ্যে সমাজের দূরতম প্রান্তে। আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, লালন ফকির, সাহেবধনী, কর্তাভজা, খুশি বিশ্বাসী আরও অনেক অকীর্তিতনাম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে। এঁদের অধিকাংশই গুরুকেন্দ্রিক। এক পথ-প্রদর্শকের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে দুর্বহ জীবনভারে মনের দিকে কুব্জপৃষ্ঠ, নুব্জদেহ এঁরা নতুন সম্প্রদায়ের দীক্ষায় লুপ্ত আত্মবিশ্বাস খানিকটা যেন ফিরে পেলেন। এঁরা সকলেই হিন্দু-মুসলিম বিরোধ অস্বীকার করেছেন, জাতপাত মানতে রাজি হননি, কোনো ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান উদ্ভাবন করেননি, আদিপ্রবক্তা ও কখনো-কখনো তাঁর বংশধর বা শিষ্যপরম্পরাগত উত্তরপুরুষকে 'গুরু' বলে মেনেছেন। ফলে সম্প্রদায়ের বাকি সকলেই স্বাভাবিকভাবেই ভাই-বোন হয়ে গেছেন। সকল ধর্মই চেষ্টা করেছে ভগবানকে 'বিশ্বপিতা' বলতে, বলেওছে শাস্ত্রবচনে, কিন্তু এর থেকে যা প্রতিপন্ন হয় অর্থাৎ তাহলে বিশ্বপিতার সকল সন্তানই সম্প্রদায়নির্বিশেষে ভাই-ভাই, এই কথাটাতেই ঠেকে গেছে। সে কি আজ? বেদান্তের মূল ভণ্ডামির উদ্ভাবনের সময় থেকেই। শংকরমতে ছুঁচো-পেঁচা-সাপ-ইঁদুর সবের মধ্যে ব্রহ্ম আছে, কিন্তু শ্লেছ চণ্ডাল-খ্রীস্টান-মুসলমানে গিয়ে হিন্দু বেদান্তীর সর্বজীবব্রহ্ম দৃষ্টি আটকে যায়। মূল ধর্মধারার এইসব ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, কাজে ও কথায় ঘোরতর অসামঞ্জস্যের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদী সংস্থাগুলির উদ্ভব হয়। এঁরা গুরুর বা তাঁর শিষ্যের রচিত গান করেন সমবেতভাবে, হয়ত বা তাঁর সমাধি বা কোনো পীঠস্থানে ফুলজলপাতা দেন; এঁদের সমবেত উৎসবে—বার্ষিক বা বিশেষ তিথিভিত্তিক—খাওয়াটা নেহাৎ দরিদ্র মানুষের মতো সাদামাটা। গান-সংকীর্তন একত্র উপাসনাই মুখ্য। ঈশ্বর, কখনো বা গুরুই বিশ্বপিতা; মানুষমাত্রেই জাতিধর্মবর্ণসম্প্রদায়নির্বিচারে তাঁর সন্তান, অতএব তারা পরস্পরের ভাই-বোন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুখ্য ধর্মপন্থানগুলি মুখে ঐক্যের কথা বললেও কাজে

বিভেদকে মেনে নেয়; তাই ঐক্য, সৌভ্রাত্র, সার্বজনীনতাকে কাজে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এইসব ছোট ছোট সম্প্রদায় তৈরি হয়। যতদিন এই বিশ্বাস ও আচরণে ঐক্য থাকে, ততদিন সজীব থাকে এই সংস্থাগুলি; যদি কাজে-কথায় গরমিল দেখা দেয়, তখন এরা ক্ষীণবল হয়ে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়, বা মূলধর্মস্রোতে বিলীন হয়ে যায়। ইংরেজ চলে যাবার পরে সাম্প্রদায়িক বিভেদ রাষ্ট্রব্যবস্থায় নীতির দিক থেকে স্বীকৃত রইল না, জাতীয় রাজনৈতিক সংস্থাগুলির মধ্যে কোনোটিই প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িকতার নীতি ঘোষণা করেনি, হিন্দুমহাসভা, মুসলিম লীগ বাদে। তবু মাঝে-মাঝেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে; ধর্মীয় সংস্থা এগিয়ে এসে থামায় না, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা ভেতরে-ভেতরে ধূমায়িত হতে থাকে। গত কুড়ি বছর ধরে সাম্প্রদায়িকতাতে যুযুধান, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতালোভী হিন্দুত্ব এতদিনে রক্তাক্ত নখদন্ত প্রকাশ করেছে। হাস্যকর-রকমে তুচ্ছ দাবি এখন যুদ্ধবাজদের ঘোষিত দাবি: যে রামের কোনো ঐতিহাসিক সত্তাই প্রমাণিত নয়, অযোধ্যা-সাকেতের ভৌগোলিক অবস্থান যেখানে সংশয়িত, রামের জন্মভূমির কোনো নির্দিষ্ট স্থান নিরূপণ যেখানে রূপকথার পরিসরেই শুধু সম্ভব, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ খবর যে, এই বৃহৎ দেশে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক নিরাশ্রয়, গৃহহীন, সেইখানে ভিন্নধর্মীর একটি প্রাচীন উপাসনাস্থান চূর্ণ করে। ঠিক সেই জায়গাতেই 'রামজন্মভূমি' মন্দির নির্মাণ করাই সবচেয়ে বড় ধর্মীয় প্রয়োজন মনে হল। কাজেই হিন্দু ধর্ম আজ তার প্রাচীন অবস্থানের যে সামান্য পরমতসহিষ্ণুতা ছিল তা বর্জন করে ধর্মের নামে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের লোভে উদগ্র হয়ে, নখদন্ত প্রকাশ করেছে। এবং মূলধর্মধারার অধিপতিরা কেউ সবাক্‌ভাবে কেউবা নীরব সম্মতি দিয়ে এ উন্মত্ততার সমর্থন করছে, অর্থাৎ এই ভ্রাতৃঘাতী ধর্মীয় জিঘাংসা বাধা পাচ্ছে না মূল ধর্মসংস্থার কাছে। এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ন্যায্য ক্ষোভের কারণ ঘটেছে এবং তাতে যদি ইসলামীয় ধর্মান্ধতা ইন্ধন জোগায়, তাহলে দেশজোড়া দাবানল জ্বলে ওঠা অনিবার্য। অবশ্য, সেটা মৌলবাদী হিন্দু একলা হাতেই সম্পাদন করতে পারে কারণ ভারতবর্ষে তারা শতকরা বিরাশি জন, অতএব প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী।

আজ হিন্দু মৌলবাদের যে অনমনীয়তা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবনবোধ, ইতিহাসে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে ভারতবর্ষের এক কাল্পনিক অতীতের অভিমুখে স্থাপন করছে, তার অমঙ্গল সুদূরপ্রসারী। কিন্তু আজ হিন্দু মৌলবাদের আড়ালে রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাই প্রতিবাদী ধর্ম দিয়ে এর প্রতিকার হবে না, সুস্থ দেশ-প্রেমিক সাধারণ মানুষ ধর্মের নামে এই অন্ধ ক্রূর জিঘাংসার প্রতিবাদ করছে সমবেত ভাবে, এবং প্রতিকার যদি আসে তো সেখান থেকেই আসবে।

ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে দেখেছি, মূল ধর্মধারার মধ্যে তত্ত্বগত, সম্প্রদায়গত ও আচরণগত অবক্ষয় ও অসহিষ্ণুতা দেখা গেলে, কিছু মানুষ বাইরে বেরিয়ে এসে সৌভ্রাত্র, সংস্কারমুক্তি, সহিষ্ণুতার বাণী প্রচার করেছে বারেবারেই। কিছুদিন পরে যদি সে সংস্থাতেও অনমনীয়তা ও অসহিষ্ণুতা প্রবেশ করে, তবে আবার মানুষ অন্যভাবে

ওই একই উদ্দেশ্যে নতুন প্রতিবাদী সংস্থা সৃষ্টি করেছে। আজই প্রথম ধর্মীয় প্রতিবাদী সংস্থার স্থান নিয়েছে সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধি। হিন্দু মৌলবাদের, 'মর্যাদা পুরুষোত্তম', 'রামরাজ্য', 'হিন্দুরাষ্ট্র' এসব ধারণা যে প্রকৃতপক্ষে সত্যকার ধর্মবোধের সঙ্গে সম্পর্কহীন, ক্ষমতালোভীর জিঘাংসাপ্রণোদিত, তা সাধারণ মানুষ বুঝছে ধীরে ধীরে, এবং হাতে হাত মিলিয়ে ঘোষণা করছে, ভারতবাসী শুধুমাত্র 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নীতির দ্বারাই চালিত হবে, মৌলবাদের দ্বারা নয়। □